তৃতীয় অধ্যায়

SEM-5 CC-12

বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব (Buddha Ethics)

১। বুদ্ধদেবের বাণী ঃ চারটি আর্য সত্য

বুদ্ধদেব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগৎকে ও জীবনকে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষের জীবন দুঃখে পূর্ণ। তিনি বুঝেছিলেন দুঃখনিবৃত্তিই মানুষের প্রধান সমস্যা। যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় দার্শনিক গবেষণায় ব্যাপৃত হওয়া মূর্খের কাজ। কাজেই বুদ্ধদেব দার্শনিক আলোচনাকে কোন প্রশ্রয় দেননি। বুদ্ধের দর্শন মূলতঃ নীতি ও ধর্মমূলক। সক্রেটিসের মতো বুদ্ধদেবও জীবনের সাথে যার সম্বন্ধ আছে প্রধানতঃ তারই আলোচনা করেছেন।

বুদ্ধদেবকে যখন দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো,—যেমন আত্মা দেহ থেকে পৃথক কোন সত্তা কিনা, মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা, এ জগৎ সসীম, না অসীম,—নিত্য, না অনিত্য—তিনি তখন এ সব প্রশ্নের উত্তর পরিহার করে চলতেন।

আত্মা কিংবা জগতের সত্তা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিমগ্ন না থেকে মানুষের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত জীবন থেকে দুঃখের মূল উৎপাটন করা। কোন শরবিদ্ধ ব্যক্তি যদি তার দেহ থেকে শর উৎপাটন না করে শরটি কোথা থেকে এল, শরটির নির্মাতা কে ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানে নিমগ্ন হয় তবে তা যেমন হাস্যকর, তেমনি জীবন থেকে দুঃখকে দূর করার চেষ্টা না করে নিরর্থক তাত্ত্বিক আলোচনায় নিমগ্ন হওয়াও হাস্যকর।

বুদ্ধদেব দশটি প্রশ্নকে অনির্দিষ্ট প্রশ্ন এবং সুষ্ঠুভাবে নৈতিক আদর্শানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন দশটি হ'ল—(১) জগৎ কি নিত্য? (২) জগৎ কি অনিত্য? (৩) জগৎ কি সসীম? (৪) জগৎ কি অসীম? (৫) আত্মা ও দেহ কি অভিন্ন? (৬) আত্মা কি দেহ হতে স্বতন্ত্র? (৭) সত্যদ্রষ্টা কি মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন? (৮) সত্যদ্রষ্টা কি মৃত্যুর পর আর কোথাও থাকেন না? (৯) তিনি কি বেঁচেও থাকেন, আবার থাকেনও না? (১০) তিনি কি বেঁচেও থাকেন না, আবার বেঁচে যে থাকেন না তাও নয়?—বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই দশটি প্রশ্ন অবিচারণীয় বা 'অব্যাকৃত' প্রশ্ন বলে পরিচিত।

চারটি আর্যসত্য (Four Noble Truths) ঃ গভীর তপস্যার দ্বারা বুদ্ধদেব যে চারটি সত্যের জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা বৌদ্ধ দর্শনে **চত্বারি আর্য সত্যানি** অর্থাৎ **আর্যসত্যচতুষ্টয়** বা **চতুরার্য সত্য** নামে অভিহিত হয়েছে। এখানে 'আর্য সত্য' মানে মহৎ সত্য। এই চারটি সত্য হল—(১) **দুঃখ** অর্থাৎ মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, (২) **দুঃখসমুদয়** অর্থাৎ দুঃখের কারণ আছে, (৩) **দুঃখনিরোধ** অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি আছে, এবং (৪) **দুঃখনিরোধমার্গ** অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে।

প্রথম আর্যসত্য ঃ দুঃখ ঃ এ জীবন ও সংসার দুঃখময়। 'সর্বং দুঃখম্'। সবই দুঃখময়। বৌদ্ধসূত্রে বলা হয়েছে, জন্ম দুঃখ, রোগ ও জরা দুঃখ, মরণ দুঃখ, ক্লেশ ও উদ্বেগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা দুঃখ, কামনার ব্যাঘাতে দুঃখ। যা কিছু আসক্তি থেকে জাত তা-ই দুঃখ। জীবের জীবন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন। এরা সবই দুঃখময়। যাকে আমরা 'সুখ' মনে করি তা ক্ষণস্থায়ী। তা অর্জন করতে দুঃখ পেতে হয়, তা রক্ষা করতে দুঃখ পেতে হয়, তার নাশে দুঃখ হয় এবং নাশের কল্পনাতেও দুঃখ। বুদ্ধদেব বলেছেন, "দুঃখোদর্ক সুখ" অর্থাৎ সুখের মধ্যেই থাকে দুঃখের বীজ। আবার যা অনিত্য

তা-ই দুঃখের। সব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী এবং সেই হেতু তারা দুঃখের সৃষ্টি করে। আমরা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ছুটে মরি। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণস্থায়ী। কাজেই যখনই ইন্দ্রিয়সুখের তিরোভাব ঘটে তখনই আমরা দুঃখ পাই। আবার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পরও মনে অতৃপ্তি থেকে যায়, ভোগের লালসা বেড়েই চলে। এ রকম অবস্থা নিঃসন্দেহে দুঃখময়। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, "চার মহাসমুদ্রের জলরাশির সাথে তোমাদের অশ্রুরাশির যদি তুলনা কর, তা হলে দেখবে তোমরা যা ভয় করেছ তা-ই তোমাদের ভাগ্যে ঘটেছে, আর যা তোমরা কামনা করেছ তা পাওনি বলে যে অশ্রুরাশি বিসর্জন করেছ তার পরিমানই বেশী হবে।" বুদ্ধদেব আরও বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আছে। সকলেরই জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু আছে—এ কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? জগৎ ও জীবন দুঃখের আগার।" এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই বুদ্ধদেব-প্রচারিত প্রথম আর্যসত্য। বুদ্ধদেবের মতে সবই যে দুঃখময়—এই হল সংসারের সত্য ছবি। দুঃখকে অতিরঞ্জিত করে তিনি দেখাননি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জাগতিক সুখভোগের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ মিশ্রিত থাকায় তা দুঃখেরই নামান্তর।

দ্বিতীয় আর্যসত্য ঃ দুঃখসমুদয় ঃ দুঃখের কারণ কি এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে উত্তর দিয়েছেন তা-ই দ্বিতীয় সত্য। জীবনে দুঃখের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর কার্যকারণ সম্বন্ধীয় নীতি, যা প্রতীত্যসমুৎপাদ নামে পরিচিত, তার সাহায্য নিয়েছেন। প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে। দুঃখ একটি বাস্তব ঘটনা। দুঃখ যখন আছে তখন দুঃখের কারণও নিশ্চয় আছে। এই দুঃখের কারণ কি—এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে উত্তর দিয়েছেন তাই 'সমুদয়' নামে পরিচিত।

দুঃখ মানে ব্যাধি, জরা, মরণ, শোক ইত্যাদি। এই জরামরণাদি দুঃখ কেন ঘটে? বুদ্ধদেব বলেন, "জরামরণাদি দুঃখের কারণ জাতি বা জন্ম। যেখানেই জাতি অথবা জন্ম সেখানেই জরা ও মৃত্যু। আমরা জন্মেছি বলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করি। জন্মের কারণ হল ভব। ভব মানে 'হওয়া' অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা। ভবের উদ্দীপনাতেই আমরা জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু এই ভব অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতারই বা কারণ কি? এর কারণ উপাদান। জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আসক্তিকে উপাদান বলা হয়। উপাদানেরও কারণ আছে এবং তা হল তৃষ্ণা বা তন্‌হা। ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করার আকাঙ্খাই তৃষ্ণা। বুদ্ধদেবের মতে তৃষ্ণা বা তন্‌হা মানুষকে বারে বারে জন্মগ্রহণ করার প্ররোচনা দেয়। তৃষ্ণাই আমাদের জন্ম ও জন্মজনিত দুঃখের অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, কেননা আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার তৃষ্ণা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা দুঃখ ভোগ করি, তারও কারণ সুখের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা। আমরা সাধারণ ভাষায় যাকে 'আকাঙ্ক্ষা' বলি, বুদ্ধদেব তাকেই তন্‌হা বলেছেন এবং তন্‌হা কথাটির মাধ্যমে নীতিবিগর্হিত আকাঙ্ক্ষাকে বোঝাতে চেয়েছেন। যে ব্যক্তি তন্‌হার বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি তন্‌হার বিষদংশনে জর্জরিত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তন্‌হাকে নিজের বশে আনতে পারে তার জীবন থেকে দুঃখ দূর হয়ে যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন, কোন বৃক্ষের মূল যদি মাটির নিচেই থেকে যায় তাহলে সেই বৃক্ষকে কেটে ফেললেও তা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি তন্‌হাকে যদি সম্পূর্ণ নির্মূল না করা যায় তাহলে দুঃখযন্ত্রণার উপশম তো হবেই না বরঞ্চ বেড়েই চলবে। তন্‌হার উপর বুদ্ধদেব এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে, তিনি তন্‌হাকেই যাবতীয় দুঃখের প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু তৃষ্ণাও অকারণে হতে পারে না। তৃষ্ণার কারণ বেদনা। পূর্বে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে তার সুখকর অনুভূতির নাম বেদনা। আমরা পূর্বে যা প্রত্যক্ষ করেছি কিংবা উপভোগ করেছি তার সাথে যদি কিছুটা সুখ-বোধ জড়িত থাকে তাহলে আবার তা ভোগ করার জন্য আমাদের মনে তৃষ্ণা না জেগে পারে না। এক কথায়, সুখস্মৃতিজড়িত পূর্ব-অভিজ্ঞতাই, অর্থাৎ বেদনাই তৃষ্ণার কারণ। আবার ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের স্পর্শ না ঘটলে বেদনার উদ্ভব হতে পারে না। কাজেই

বেদনার কারণ 'স্পর্শ'। এই স্পর্শের বা সংযোগের কারণ ষড়ায়তন অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক—এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন। আমাদের প্রত্যেকের এই ছয়টি ইন্দ্রিয় আছে। বিষয়বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ থেকে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়, নতুবা আমাদের কোন অভিজ্ঞতা হতো না। কিন্তু দেহ ও মন যাকে একত্রে নামরূপ বলে তা না থাকলে ষড়ায়তনও থাকতে পারতো না। নামরূপ মানে দেহসংযুক্ত মন অথবা মনসংযুক্ত দেহ। প্রত্যেক মানুষের এ রকম এক দেহমন সমন্বিত সত্তা আছে। এই নামরূপ আসে কোথা থেকে? বৌদ্ধমতে মাতৃগর্ভে নামরূপের বা দেহমনের গঠন সম্ভব হতো না যদি না বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাথমিক চেতনা থাকতো। বৌদ্ধমতে জন্মের পূর্বে নামরূপ মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকারে থাকে। মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণাকারে নামরূপ থাকে, তখন তার মধ্যে চেতনা বা বিজ্ঞান না থাকলে ভ্রূণ সজীব থাকতে পারতো না কিংবা তার বৃদ্ধিও হতো না। অতএব বিজ্ঞান বা চেতনাই নামরূপের কারণ। বিজ্ঞানেরও কারণ আছে। পূর্বজন্মের সংস্কার* থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। পূর্বজন্মে আমরা যা কামনা করি বা যে সব কাজ করি তা আমাদের জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায় না, তা মনের মধ্যে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বিরাজ করে। একেই বলে **সংস্কার**। মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের উদ্ভব হয়, তখন এইসব স্মৃতি বা সংস্কার ভ্রূণের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি করে। এই সংস্কারের আবার কারণ হল **অবিদ্যা**। অনিত্যকে নিত্য মনে করা, মিথ্যাকে সত্য মনে করা—এরকম ভ্রান্তিকে বলে অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞানতা সর্বপ্রকার দুঃখের মূল কারণ।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—(১) জরামরণাদি দুঃখের কারণ, (২) 'জাতি', (৩) জাতির কারণ হল 'ভব', (৪) ভবর কারণ 'উপাদান', (৫) উপাদানের কারণ 'তৃষ্ণা', (৬) তৃষ্ণার কারণ 'বেদনা', (৭) বেদনার কারণ 'স্পর্শ', (৮) স্পর্শের কারণ 'ষড়ায়তন', (৯) ষড়ায়তনের কারণ 'নামরূপ', (১০) নামরূপের কারণ 'বিজ্ঞান', (১১) বিজ্ঞানের কারণ 'সংস্কার' এবং (১২) সংস্কারের কারণ হল 'অবিদ্যা'।

আমরা এতক্ষণ কার্য থেকে কারণের দিকে অগ্রসর হয়েছি। আমরা কারণ থেকে কার্যের দিকেও যেতে পারি। যেখানে—(১) 'অবিদ্যা' আছে সেখানে (২) 'সংস্কার' এসে জমা হয়। পূর্বজন্মের এই অবিদ্যা ও সংস্কারের স্মৃতি থেকে আসে (৩) 'বিজ্ঞান' বা চেতনা যার ফলে মাতৃগর্ভে (৪) 'নামরূপের সৃষ্টি হয়। নামরূপ থেকে (৫) 'ষড়ায়তনের' উদ্ভব। ষড়ায়তনের জন্য ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের (৬) 'স্পর্শ' ঘটে। স্পর্শের ফলে (৭) 'বেদনা' বা সুখবোধ হয়। বেদনা হয় বলে তা পুনরায় ভোগের (৮) 'তৃষ্ণা' জাগে। তৃষ্ণা থেকে (৯) 'উপাদান' বা বিষয়াসক্তির সৃষ্টি হয়। 'উপাদান' থেকে উদ্ভূত হয় (১০) 'ভব' বা জন্মগ্রহণের ব্যাকুলতা। ভব থেকে আসে (১১) 'জাতি' বা জন্ম এবং জন্মগ্রহণ করি বলে (১২) জরামরণাদি দুঃখভোগ উপস্থিত হয়।

দুঃখের যে কার্যকারণ শৃঙ্খলের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মোট দ্বাদশটি নিদান আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই কার্যকারণশৃঙ্খলকে দ্বাদশনিদান বলে। একে আবার **ভবচক্রও** বলা হয়, কারণ এই দ্বাদশনিদানের ক্রিয়ার জন্যই, মানুষ এই ভবসংসারে চক্রবৎ যাতায়াত করছে, অর্থাৎ তার জন্ম হচ্ছে, দুঃখভোগ হচ্ছে, এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে।

এই দ্বাদশ নিদান মানুষের জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে এক কার্যকারণ শৃঙ্খলে

---

* "কোন ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য ও ক্রিয়ারূপ যে সকল কর্ম পাপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং যাহা বিশেষ করিয়া জন্মের কামনার সংযোগ দ্বারা প্রবল হইয়া নতুন দেহ ধারণ করে তাহাদিগকে সংস্কার বলা হয়।"—প্রাচ্য ও পশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ১ম খন্ড ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮১।

যুক্ত করেছে। এ দ্বাদশ নিদানকে তাই কারণের দিক থেকে কার্যের দিকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন অনুযায়ী নিম্নলিখিত রূপে সাজানো যেতে পারে ঃ

(১) অবিদ্যা... ...
(২) সংস্কার... ...
(৩) বিজ্ঞান... ...
(৪) নামরূপ... ...
(৫) ষড়ায়তন... ...
(৬) স্পর্শ... ...
(৭) বেদনা... ...
(৮) তৃষ্ণা... ...
(৯) উপাদান... ...
(১০) ভব... ...
(১১) জাতি... ...
(১২) জরামরণাদি দুঃখ ...

তৃতীয় আর্যসত্য ঃ দুঃখনিরোধ ঃ দুঃখের উৎপত্তিরোধ ও দুঃখের বিনাশ-সাধনই দুঃখনিরোধ এবং এই হল তৃতীয় আর্যসত্য। এ সত্যটি দ্বিতীয় আর্যসত্য থেকে নিঃসৃত। দুঃখের যেসব কারণ রয়েছে সেগুলিকে রোধ করতে পারলেই দুঃখনিরোধ সম্ভব হবে। তৃষ্ণা, অবিদ্যা প্রভৃতি কারণগুলিকে নিঃশেষে বর্জন করে দুঃখের মূলোৎপাটন করাই দুঃখনিরোধ এবং একেই বলে **নির্বাণ**।

দুঃখ রোধ করা যায়; দুঃখ নিরোধের অবস্থাকে নির্বাণ বলে

ভোগস্পৃহা দূর হলে যখন আর বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন মানুষের পুনর্জন্ম গ্রহণের সম্ভবনা আর থাকে না। তখন মানুষ এই সংসার থেকে মুক্ত হয়, জরামরণের অধীন সে আর তখন থাকে না। জরামরণের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে মানুষ তখন দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে। এ অবস্থায় তাকে বলা হয় 'অর্হৎ' বা পূজনীয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধই নির্বাণ। দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তিই নির্বাণ। প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নিভে যায়, ঠিক তেমনি নির্বাণে তৃষ্ণার রোধ হয়। তৃষ্ণার নাশ হলে উপাদানের নাশ হয় এবং উপাদানের নাশ হলে মানুষকে আর জরামরণাদি দুঃখের কবলে পড়তে হয় না।

বুদ্ধদেবের মতে নির্বাণ এ জীবনেই লাভ করা যায়। নির্বাণ একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়। বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করার পর সর্বমানবের হিতের জন্য সক্রিয় প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিষ্কাম কর্ম কখনই বন্ধনের কারণ নয়। অনেকে নির্বাণ বলতে অস্তিত্বের আত্যন্তিক নাশ বুঝে থাকেন। কিন্তু তাহলে স্বীকার করতে হয়, বুদ্ধদেব মৃত্যুর পূর্বে নির্বাণপ্রাপ্ত হননি। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের নিজের কথাকে অবিশ্বাস করতে হয়। সুতরাং নির্বাণ আত্যন্তিক নাশ নয়। নির্বাণ বলতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ বুঝায়। নির্বাণ একটি শান্ত অবস্থা। 'নির্বাণং শান্তম্'।

এ জীবনেই নির্বাণ লাভ করা যায়

চতুর্থ আর্যসত্য ঃ দুঃখনিরোধমার্গ ঃ কি উপায়ে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি তা চতুর্থ আর্যসত্যে বলা হয়েছে। অবশ্য দুঃখনিরোধ সহজসাধ্য নয়। এর জন্য অক্লান্ত প্রয়াস ও সাধনার প্রয়োজন। দুঃখনিরোধমার্গে এই সাধনার কথা বলা হয়েছে। 'মার্গ' মানে পথ। অতএব দুঃখনিরোধমার্গ মানে সেই পথ যা অনুসরণ করে দুঃখের অবসান ঘটানো যায়। চতুর্থ আর্যসত্যকে

বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি বলা হয়। দুঃখনিরোধের উপায় হিসাবে বুদ্ধদেব আটটি নিয়ম বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের (eightfold noble path) উল্লেখ করেছেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি অঙ্গসমন্বিত পথকে বৌদ্ধধর্মে মধ্যপন্থা বলা হয়েছে। মধ্যপন্থা বলার কারণ হল—এই পথ একদিকে অসংযত ভোগবিলাস এবং অন্যদিকে শারীরিক কৃচ্ছতাসাধন, এই দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী। এই মধ্যপন্থাই হল সাধনার উৎকৃষ্ট ও সহজ পথ। এতে যেমন অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগ নেই, তেমনি নেই অনাবশ্যকভাবে শরীরকে কষ্ট দেওয়া। বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা সাধারণ মানুষ, সকলেই এই পথ অনুসরণ করতে পারে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গ হল—

(১) **সম্যক্ দৃষ্টি বা সম্মাদিথি ঃ** দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা বা মিথ্যাদৃষ্টি। অবিদ্যার জন্য অর্থাৎ সত্যদৃষ্টির অভাবের জন্য আমরা জগতের ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করি, যা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল তাকে নিত্যসত্য মনে করে তাকে পাবার জন্য ছুটে মরি। এভাবে মিথ্যাকে সত্য মনে করে আমরা নানা দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং সর্বাগ্রে এই মিথ্যাদৃষ্টি বর্জন করে 'সম্যক্ দৃষ্টি' অর্জন করতে হবে। চারটি আর্যসত্যের তাৎপর্য ও যাথার্থ্য উপলব্ধি করাকেই বলে সম্যক দৃষ্টি।

(২) **সম্যক্ সংকল্প বা সম্মা সংকল্প ঃ** সম্যক্ দৃষ্টি বা সত্য জ্ঞান লাভের পর তার আলোকে জীবন পরিচালিত করতে না পারলে সেই জ্ঞান বৃথা। সম্যক্ দৃষ্টিতে আমরা মহাসত্যগুলি উপলব্ধি করি। কিন্তু শুধু উপলব্ধিতে কাজ হয় না। যাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছি সেই সত্য অনুসারে কাজ করার, জীবন পরিচালনা করার সংকল্প করা চাই। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলে চলবে না, তাকে কার্যে পরিণত করার, জীবনে প্রয়োগ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। একেই বলে সম্যক সংকল্প। এজন্য বুদ্ধদেব সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে, পরের প্রতি দ্বেষ পোষণ না করতে, কারও অনিষ্ট করবো না এ রকম সংকল্প গ্রহণ করতে তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(৩) **সম্যক্ বাক্ বা সম্মা বাচা ঃ** সম্যক্ সংকল্প কর্মে রূপায়িত করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন বাক্ সংযমের। বিভিন্ন কর্মের মধ্যে বাক্‌ই প্রথম ও প্রধান। বাক্ সংযম না করতে পারলে নৈতিক উন্নতির আশা করা যায় না। সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। সত্য না বলতে গিয়ে যদি মৃত্যুও ঘটে, তবু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। পরনিন্দা এবং কর্কশ বাক্য পরিহার করতে হবে। তাছাড়া লঘু ও চপল বিষয়ের আলাপও বর্জন করতে হবে। সত্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে তা অপ্রিয়ভাবে না বলে মিষ্টভাবে বলা উচিত। কাজেই সত্যবাক্য প্রিয়ভাবে বলা, মিথ্যাভাষণ থেকে বিরতি, পরনিন্দা ও কর্কশ বাক্য পরিহার এবং লঘু বিষয়ের আলাপ বর্জন করাই 'সম্যক্ বাক্'। বাক্ সংযম মোটেই সহজ নয়, এর জন্য মনের উপর কঠোর শাসন থাকা দরকার।

(৪) **সম্যক্ কর্মান্ত বা সম্মা কম্মান্ত ঃ** কেবল বাক্ সংযমেই সংকল্প শেষ হয়ে যায় না। সম্যক্ সংকল্পের প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত আচরণের মাধ্যমে হওয়া চাই। সম্যক্ কর্মান্ত মানে সংযতভাবে আচরণ ও কর্ম করা। শুধু সৎ ভাষণই নয়, স্বার্থহীন কর্মেরও অনুশীলন কর্তব্য। জীবহত্যা, চুরি করা, অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবা থেকে বিরতিকে বুদ্ধদেব সম্যক্ কর্মান্ত বলেছেন। 'শীল' ও 'দান' সম্যক্ কর্মান্তের অন্তর্গত। চুরি, হিংসা, কামভোগ, মিথ্যা বলা, নেশা না করা হল 'শীল', আর দরিদ্রের জন্য আত্মত্যাগ হল 'দান'।

(৫) **সম্যক্ আজীব বা সম্মা আজীব ঃ** জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সৎভাবে অর্জন করতে হবে এবং সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এই হল সম্যক্ আজীবের অর্থ। এই নির্দেশ কর্মসংক্রান্ত ব্যাপার বলে সম্যক্ কর্মান্তের অন্তর্গত হওয়া উচিত ছিল। তা সত্ত্বেও সম্যক আজীব সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে। মানুষের জীবনে এমন অনেক সংকট মুহূর্ত আসে যখন অসৎ বা বা নীতিবিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন না করলে তার প্রাণ